চিরায়ত বই

৩০

ইছামতী

ইছামতী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

KOBI PROKASHANI

ইছামতী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫০০ টাকা

Ichhamati (A novel) by Bibhutibhushan Bandyopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: August 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US$ 25
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99332-3-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

কল্যাণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ মুরাতিপুর গ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) 'প্রবাসী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় 'উপেক্ষিতা' নামক গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ভাগলপুরে কাজ করার সময় ১৯২৫ সালে তিনি 'পথের পাঁচালী' রচনা শুরু করেন। এই বই লেখার কাজ শেষ হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি বিভূতিভূষণের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কাহিনিকে চলচ্চিত্রে রূপদানের মাধ্যমে তার চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা করেছিলেন। এই সিনেমাটির নামও ছিল 'পথের পাঁচালী'। এই চলচ্চিত্রটি দেশি-বিদেশি প্রচুর পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছিল। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজি ও ফরাসিসহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণসাহিত্য, দিনলিপি সাহিত্যের নানা বিষয়ে লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনাবলি : 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু-হোটেল', 'ইছামতী', 'অশনি সংকেত', 'মেঘমল্লার', 'তালনবমী', 'চাঁদের পাহাড়', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান' ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার : রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর, ১৯৫১)

দাম্পত্যসঙ্গী : গৌরী দেবী, রমা দেবী।

সন্তান : তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু : ১ নভেম্বর ১৯৫০ সালে।

ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্তত যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমির-কামট-হাঙর-সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন সুন্দরবনে সুঁদরি-গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোনো লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করছেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলিতে মুখর।

মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত—দেখতে পাবে দুধারে পলতেমাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হলদে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাচড়া-বৈঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিকের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দূর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধু চখা বালির ঘাট, বনকুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গ-কাকলি-মুখর বনান্তস্থলি। গ্রামের ঘাটে কোথাও দু-দশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েছে। ক্বচিৎ উঁচু শিমুল গাছের আঁকাবাঁকা শুকনো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অংকিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইছে, কাঁখে কলসি ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। এক-আধ জায়গায় গাঙের উঁচু পাড়ের কিনারায় মাঠের মধ্যে কোনো গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুল; লম্বা ধরনের চালাঘর, দরমার কিংবা কঞ্চির বেড়ার ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা; আসবাবপত্রের মধ্যে দেখা যাবে ভাঙা নড়বড়ে একখানা চেয়ার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, আর খানকতক বেঞ্চি।

সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্মদিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরনো পোড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্তমানে হয়তো আকন্দঝোপে ঢেকে ফেলেছে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু-একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েছে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এইসব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেইসব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এইসব বাস্তুভিটের

সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মতো আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

সেইসব বাণী, সেইসব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক-জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনি নয়।

১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েছে সবে।

পথঘাটে তখনো কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখি বসে আছে বাবলা গাছের ফুলে-ভর্তি ডালে।

নালু পাল মোল্লাহাটির হাটে যাবে পান-সুপুরি নিয়ে মাথায় করে। মোল্লাহাটি যেতে নীলকুঠির আমলের সাহেবদের বটগাছের ঘন ছায়া পথে পথে। শ্রান্ত নালু পাল মোট নামিয়ে একটা বটতলায় বসে গামছা ঘুরিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

নালুর বয়স কুড়ি-একুশ হবে। কালো রোগা চেহারা। মাথার চুল বাবরি-করা, কাঁধে রঙিন রাঙা গামছা—তখনকার দিনের শৌখিন বেশভূষা পাড়াগাঁয়ের। এখনও বিয়ে করেনি, কারণ আমাদের আশ্রয়ে এতদিন মানুষ হচ্ছিল, হাতেও ছিল না কানাকড়ি। সম্প্রতি আজ বছরখানেক হলো নালু পাল মোট মাথায় করে পান-সুপুরি বিক্রি করে হাটে হাটে। সতেরো টাকা মূলধন তার এক মাসিমা দিয়েছিলেন জুগিয়ে। এক বছরে এই সতেরো টাকা দাঁড়িয়েছে সাতান্ন টাকায়। খেয়ে দেয়ে। নিট লাভের টাকা।

নালুর মন এজন্যে খুশি আছে খুব। মামার বাড়ির অনাদরের ভাত গলা দিয়ে ইদানীং আর নামত না। একুশ বছর বয়সের পুরুষমানুষের শোভা পায় না অপরের গলগ্রহ হওয়া। মামিমার সে কী মুখনাড়া একপলা তেল বেশি মাথায় মাখবার জন্যে সেদিন!

মুখনাড়া দিয়ে বললেন—তেল জুটবে কোত্থেকে অত? আবার বাবরি চুল রাখা হয়েচে, ছেলের শখ কত—অত শখ থাকলে পয়সা রোজগার করতে হয় নিজে।

নালু পাল হয়তো ঘুমিয়ে পড়ত বটগাছের ছায়ায়, এখনও হাট বসবার অনেক দেরি, একটু বিশ্রাম করে নিতে সে পারে অনায়াসে—কিন্তু এই সময় ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক যেতে যেতে ওর সামনে থামল।

নালু পাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—রায়মশায়, ভালো আছেন? প্রাতোপেন্নাম—

—কল্যাণ হোক। নালু যে, হাটে চললে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটু সোজা হয়ে বোসো। শিপটন সাহেব ইদিকে আসচে—

—বাবু, রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে যাব? বড্ড মারে শুনিচি।

—না না, মারবে কেন? ওসব বাজে। বোসো এখানে।

—ঘোড়ায় যাবেন?

—না, বোধহয় টমটমে। আমি দাঁড়াবো না।

মোল্লাহাটি নীলকুঠির বড়সাহেব শিপটনকে এ অঞ্চলে বাঘের মতো ভয় করে লোকে। লম্বাচওড়া চেহারা, বাঘের মতো গোল মুখখানা, হাতে সর্বদাই চাবুক থাকে। এ অঞ্চলের লোক চাবুকের নাম রেখেছে 'শ্যামচাঁদ'। কখন কার পিঠে 'শ্যামচাঁদ' অবতীর্ণ হবে তার কোনো স্থিরতা না থাকাতে সাহেব রাস্তায় বেরুলে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

এমন সময়ে আর একজন হাটুরে দোকানদার সতীশ কলু, মাথায় সর্ষে তেলের বড় ভাঁড় চ্যাঙারিতে বসিয়ে সেখানে এসে পড়ল। রাস্তার ধারে নালুকে দেখে বললে—চলো, যাবা না?

—বোসো। তামাক খাও।

—তামাক নেই।

—আমার আছে। দাঁড়াও, শিপটন সাহেব চলে যাক আগে।

—সায়েব আসচে কেডা বললে?

—রায়মশায় বলে গ্যালেন—বোসো—

হঠাৎ সতীশ কলু সামনের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখে ষাঁড়া আর শেওড়া ঝোপের পাশ দিয়ে নিচের ধানের ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল। যেতে যেতে বললে—চলে এসো, সায়েব বেরিয়েচে—

নালু পাল পানের মোট গাছতলায় ফেলে রেখেই সতীশ কলুর অনুসরণ করলে। দূরে ঝুমঝুম শব্দ শোনা গেল টমটমের ঘোড়ার। একটু পরে সামনের রাস্তা কাঁপিয়ে সাহেবের টমটম কাছাকাছি এসে পড়ল এবং থামবি তো থাম একেবারে নালু পালের আশ্রয়স্থল ওদের বটতলায়, ওদের সামনে।

বটতলায় পানের মোট মালিকহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সাহেব হেঁকে বললে—এই! মোট কাহার আছে?

নালু পাল ও সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে কাঠ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণ। কেউ উত্তর দেয় না।

টমটমের পেছন থেকে নফর মুচি আরদালি হাঁকল—কার মোট পড়ে রে গাছতলায়?

সাহেব বললে—উট্টর ডাও—কে আছে?

নালু পাল কাঁচুমাচু মুখে জোড় হাতে রাস্তায় উঠে আসতে আসতে বললে—সায়েব, আমার।

সাহেব ওর দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। কোনো কথা বললে না।

নফর মুচি বললে—তোমার মোট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী করছিলে ধানক্ষেতে?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

সাহেব বললে—আমি জানে। আমাকে ডেখে সব লুকায়। আমি সাপ আছি, না বাঘ আছি, হ্যাঁ?

প্রশ্নটা নালু পালের মুখের দিকে তাকিয়েই, সুতরাং নালু পাল ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—না সাহেব।

—ঠিক। মোট কীসের আছে?

—পানের, সাহেব।

—মোল্লাহাটির হাটে নিয়ে যাচ্ছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী নাম আছে টোমার?

—আজ্ঞে, শ্রীনালমোহন পাল।

—মাথায় করো। ভবিষ্যতে আমায় ডেখে লুকাবে না। আমি বাঘ নই, মানুষ খাই না। যাও—বুঝলে!

—আজ্ঞে—

সাহেবের টমটম চলে গেল। নালু পালের বুক তখনো ঢিপঢিপ করছে। বাবা, এক ধাক্কা সামলানো গেল বটে আজ। সে শিস দিতে দিতে ডাকল—ও সতীশ খুড়ো!

সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তা থেকে আরও দূরে চলে গিয়েছিল। ফিরে কাছে আসতে আসতে বললে—যাই।

—বাবাঃ, কতদূর পালিয়েছিলে? আমায় ডাকতে দেখে বুঝি দৌড় দিলে ধানবন ভেঙে?

—কী করি বলো। আমরা হলাম গরিব-গুরবো নোক। শ্যামচাঁদ পিঠে বসিয়ে দিলে করচি কী ভাই বলো দিনি। কী বললে সায়েব তোমারে?

—বললে ভালোই।

—তোমারে রায়মশায় কী বলছিল?

—বলছিল, সায়েব আসচে। সোজা হয়ে বোসো।

—তা বলবে না? ওরাই তো সায়েবের দালাল। কুঠির দেওয়ানি করে সোজা রোজগারটা করেচে রায়মশাই! অতবড় দোমহলা বাড়িটা তৈরি করলে সে-বছর।

রায়মশায়ের পুরো নাম রাজারাম রায়। মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবের খয়েরখাঁই ও প্রজাপীড়নের জন্যে এদেশের লোক যেমন ভয় করে, তেমনি ঘৃণা করে। কিন্তু মুখে কারও কিছু বলবার সাহস নেই। নিকটবর্তী পাঁচপোতা গ্রামে বাড়ি।

বিকেলের সূর্য বাগানের নিবিড় সবুজের আড়ালে ঢলে পড়েছে, এমন সময় রাজারাম রায় নিজের বাড়িতে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামলেন। নফর মুচির এক খুড়তুতো ভাই ভজা মুচি এসে ঘোড়া ধরলে। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চেয়ে দেখলেন অনেকগুলো লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। নীলকুঠির দেওয়ানের চণ্ডীমণ্ডপে অমন ভিড় বারো মাসই লেগে আছে। কত রকমের দরবার করতে এসেছে নানা গ্রামের লোক, কারও জমিতে ফসল ভেঙে নীল বোনা হয়েছে জোর-জবরদস্তি করে, কারও নীলের দাদনের জন্যে যে

জমিতে দাগ দেওয়ার কথা ছিল তার বদলে অন্য এবং উৎকৃষ্টতর জমিতে কুঠির আমিন গিয়ে নীল বোনার জন্যে চিহ্নিত করে এসেছে—এইসব নানা রকমের নালিশ।

নালিশের প্রতিকার হতো। নতুবা দেওয়ানের চণ্ডীমণ্ডপে লোকের ভিড় জমত না রোজ রোজ। তার জন্যে ঘুষ-ঘাষের ব্যবস্থা ছিল না। রাজারাম রায় কারও কাছে ঘুষ নেবার পাত্র ছিলেন না, তবে কার্য অন্তে কেউ একটা রুই মাছ কি বড় একটা মানকচু কিংবা দুভাঁড় খেজুরের নলেন গুড় পাঠিয়ে দিলে ভেটস্বরূপ, তা তিনি ফেরত দেন বলে শোনা যায়নি।

রাজারামের স্ত্রী জগদম্বা এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন, পরনে লালপেড়ে তাঁতের কোরা শাড়ি, হাতে বাউটি পৈঁছে, লোহার খাড়ু ও শাঁখা, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, দোহারা চেহারার গিন্নিবান্নি মানুষটি।

জগদম্বা এগিয়ে এসে বললেন—এখন বাইরে বেরিও না। সন্দে-আহ্নিক সেরে নাও আগে।

রাজারাম হেসে স্ত্রীর হাতে ছোট একটা থলি দিয়ে বললেন—এটা রেখে দাও। কেন, কিছু জলপান আছে বুঝি?

—আছেই তো। মুড়ি আর ছোলা ভেজেচি।

—বাঃ বাঃ, দাঁড়াও আগে হাত-পা ধুয়ে নিই। তিলু বিলু নিলু কোথায়?

—তরকারি কুটচে।

—আমি আসচি। তিলুকে জল দিতে বলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রাজারাম আহ্নিক করতে বসলেন রোয়াকের একপ্রান্তে। তিলু এসে আগেই সেখানে একখানা কুশাসন পেতে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করলেন—ঘণ্টাখানেক প্রায়। অনেক কিছু স্তব-স্তোত্র পড়লেন।

এত দেরি হওয়ার কারণ এই, সন্ধ্যা-গায়ত্রী শেষ করে রাজারাম বিবিধ দেবতার স্তবপাঠ করে থাকেন। দেবদেবীর মধ্যে প্রতিদিন তুষ্ট রাখা উচিত মনে করেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, রক্ষাকালী, সিদ্ধেশ্বরী ও মা মনসাকে। এঁদের কাউকে চটালে চলে না। মন খুঁত-খুঁত করে। এঁদের দৌলতে তিনি করে খাচ্ছেন। আবার পাছে কোন দেবী শুনতে না পান, এজন্যে তিনি স্পষ্টভাবে টেনে টেনে স্তব উচ্চারণ করে থাকেন।

তিলু এসে বললে—দাদা, ডাব খাবে এখন?

—না। মিছরির জল নেই?

—মিছরি ঘরে নেই দাদা।

—ডাব থাক, তুই জলপান নিয়ে আয়।

তিলু একটা কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি ও ছোলাভাজা সর্ষের তেল দিয়ে জবজবে করে মেখে নিয়ে এলো—সে জামবাটিতে অন্তত আধ কাঠা মুড়ি ধরে। বিলু নিয়ে এলো একটা কাঁসার থালায় একথালা খাজা কাঁঠালের কোষ। নিলু নিয়ে এলো এক ঘটি জল ও একটা পাথরের বাটিতে আধ পোয়াটাক খেজুর গুড়।

রাজারাম নিলুকে সস্নেহে বললেন—বোস নিলু, কাঁটাল খাবি?

—না দাদা। তুমি খাও, আমি অনেক খেয়েচি।

—বিলু নিবি?

—তুমি খাও দাদা।

জগদম্বা এতক্ষণে আহ্নিক সেরে এসে স্বামীর কাছে বসলেন—তুমি সারাদিন খেটেখুটে এলে, খাও না জলপান। না খেলে বাঁচবে কীসে? পোড়ারমুখো সাহেবের কুঠিতে তো ভূতোনন্দী খাটুনি।

রাজারাম বললেন—কাঁচালঙ্কা নেই? আনতে বলো।

—বাতাস করবো? ও তিলু, তোর ছোট বৌদিদির কাছ থেকে কাঁচালঙ্কা চেয়ে আন—ডালে ধরা গন্ধ বেরুলো কেন দ্যাখো না, ও নেত্য পিসি? ছোটবৌ গিয়ে দ্যাখো তো—

জগদম্বা কাছে বসে বাতাস করতে করতে বললেন—ওগো, জলপান খেয়ে বাইরে যেও না, একটা কথা আছে—

—কী?

—বলচি। ঠাকুরঝিরা চলে যাক।

—চলে গিয়েচে। ব্যাপার কী?

—একটি সুপাত্র এসেচে এই গ্রামে। ঠাকুরঝিদের বিয়ের চেষ্টা দ্যাখো।

—কে বলো তো?

—সন্নিসি হয়ে গিইছিল। বেশ সুপুরুষ। চন্দ্র চাটুয্যের দূর সম্পর্কের ভাগনে। সে কাল চলে যাবে শুনচি—একবার যাও সেখানে—

—তুমি কী করে জানলে?

—আমাকে দিদি বলে গেলেন যে। দুবার এসেছিলেন আমার কাছে।

—দেখি।

—দেখি বললে চলবে না। তিলুর বয়েস হলো তিরিশ। বিলুর সাতাশ। এর পরে আর পাত্তর জুটবে কোথা থেকে শুনি? নীলকুঠির কিচিরমিচির একদিন বন্ধ রাখলেও খেতি হবে না।

—তাই যাই তবে। চাদরখানা দ্যাও। তামাক খেয়ে তবে বেরুবো।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে গেলেন না, যাওয়ার উপায় থাকবে না। মহরালি মণ্ডলের সম্পত্তি ভাগের দিন, তিনিই ধার্য করে দিয়েছেন। ওরা এতক্ষণ ঠিক এসে বসে আছে—রমজান, সুকুর, প্রহ্লাদ মণ্ডল, বনমালী মণ্ডল প্রভৃতি মুসলমান পাড়ার মাতব্বর লোকেরা। ও পথে গেলে এখন বেরুতে পারবেন না তিনি।

চন্দ্র চাটুয্যে গ্রামের আর একজন মাতব্বর লোক। সত্তর-বাহাত্তর বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমির আয় থেকে ভালোভাবেই সংসার চলে যায়। পাঁচপোতা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার কেউই চাকরি করেন না। কিছু না কিছু জমিজমা সকলেরই আছে। সন্ধ্যার পর নিজ নিজ চণ্ডীমণ্ডপে পাশা-দাবার আড্ডায় রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাটানো এঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস।

চন্দ্র চাটুয্যে রাজারামকে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে বললেন—বাবাজি এসো। মেঘ না চাইতে জল! আজ কী মনে করে? বোসো বোসো। একহাত হয়ে যাক।

নীলমণি সমাদ্দার বলে উঠলেন—দেওয়ানজি যে, এদিকে এসে মন্ত্রীটা সামলাও তো দাদাভাই—

ফণী চক্কত্তি বললেন—আমার কাছে বোসো ভাই, এখানে এসো। তামাক সাজবো?

রাজারাম হাসিমুখে সকলকেই আপ্যায়িত করে বললেন—বোসো দাদা! চন্দর কাকা, আপনার এখানে দেখচি মস্ত আড্ডা—

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আসো না তো বাবাজি কোনোদিন? আমরা পড়ে আছি একধারে, দ্যাখো না তো চেয়ে।

রাজারাম শতরঞ্জির ওপর পা দিতে না দিতে প্রত্যেকে আগ্রহের সঙ্গে সরে বসে তাঁকে জায়গা করে দিতে উদ্যত হলো। নীলমণি সমাদ্দার অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থার গৃহস্থ, সকলের মন রেখে কথা না বললে তাঁর চলে না। তিনি বললেন—দেওয়ানজি আসবে কী, ওর নিজের চণ্ডীমণ্ডপে রোজ সন্দেবেলা কাছারি বসে। আসামি ফরিয়াদির ভিড় ঠেলে যাওয়া যায় না। ও কি দাবার আড্ডায় আসবার সময় করতে পারে?

ফণী চক্কত্তি বললেন—সে আমরা জানি। তুমি নতুন করে কী শোনালে কথা।

নীলমণি বললেন—দাবায় পাকা হাত। একহাত খেলবে ভায়া?

রাজারাম এগিয়ে এসে হুঁকো নিলেন ফণী চক্কত্তির হাত থেকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ চন্দ্র চাটুয্যের সামনে তামাক খাবেন না বলে চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরের ঘরে হুঁকো হাতে ঢুকে গেলেন এবং খানিক পরে এসে নীলমণির হাতে হুঁকো দিয়ে পূর্বস্থানে বসলেন।

দাবা খেলা শেষ হলো। রাত দশটারও বেশি। লোকজন একে একে চলে গেল।

চন্দ্র চাটুয্যেকে রাজারাম তাঁর আগমনের কারণ খুলে বললেন। চন্দ্র চাটুয্যের মুখ উজ্জ্বল দেখাল।

রাজারামের হাত ধরে বললেন—এইজন্যে বাবাজির আসা? এ কঠিন কথা কী! কিন্তু একটা কথা বাবা। ভবানী সন্নিসি হয়ে গিইছিল, তোমাকে সে কথাটা আমার বলা দরকার।

—বাড়ি গিয়ে আপনার বৌমাদের কাছে বলি। তিলুকে জানাতে হবে, ওরাই জানাবে—

—বেশ।

পরে সুর নিচু করে বললেন—একটা কথা বলি। ভবানীকে এখানে বাস করাবো এই আমার ইচ্ছে। তুমি গিয়ে তোমার তিনটি বোনের বিয়েই ওর সঙ্গে দ্যাও গিয়ে—বালাই চুকে যাক। পাঁচবিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি যতুক দেবে। এখুনি সব ঠিক করে দিচ্চি—

রাজারাম চিন্তিত মুখে বললেন—বাড়ি থেকে না জিজ্ঞেস করে কোনো কিছুই বলতে পারবো না কাকা। কাল আপনাকে জানাবো।

—তুমি নির্ভয়ে বিয়ে দাও গিয়ে। আমার ভাগনে বলে বলচিনে। কাটাদ' বন্দিঘাটির বাঁরুরি, এক পুরুষে ভঙ্গ, ঘটকের কাছে কুলুজি শুনিয়ে দেবো এখন। জ্বলজ্বলে কুলীন, একডাকে সকলে চেনে।

—বয়েস কত হবে পাত্তরের?

—তা পঞ্চাশের কাছাকাছি। তোমার বোনদেরও তো বয়স কম নয়। ভবানী সন্নিসি না হয়ে গেলি এতদিন সাতছেলের বাপ। দ্যাখো আগে তাকে—নদীর ধারে রোজ এক ঘণ্টা সন্দে-আহ্নিক করে, তারপর আপন মনে বেড়ায়, এই চেহারা! এই হাতের গুল!

—ভবানী রাজি হবেন তিনটি বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করতে?

—সে ব্যবস্থা বাবাজি, আমার হাতে। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

একটু অন্ধকার হয়েছিল বাঁশবনের পথে। জোনাকি জ্বলছে কুঁচ আর বাবলা গাছের নিবিড়তার মধ্যে। ছাতিম ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে বনের দিক থেকে।

অনেক রাত্রে তিলোত্তমা কথাটা শুনলে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে নদীর দিকের বাঁশঝাড়ের পেছন দিয়ে। ছোট বোন বিলুকে ডেকে বললে—ও বিলু, বৌদিদি তোকে কিছু বলেচে?

—বলবে না কেন? বিয়ের কথা তো?

—আ মরণ, পোড়ার মুখ, লজ্জা করে না?

—লজ্জা কী? ধিঙ্গি হয়ে থাকা খুব মানের কাজ ছিল বুঝি?

—তিনজনকেই একক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে, তা শুনেচ তো?

—সব জানি।

—রাজি?

—সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে আমার কথা এই যে—হয় তো হয়ে যাক।

—আমারও তাই মত। নিলুর মতটা কাল সকালে নিতে হবে।

—সে আবার কী বলবে, ছেলেমানুষ, আমরা যা করবো সেও তাতে মত দেবেই।

তিলু কত রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশবছর তার বয়েস হয়েছে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনও বিশ্বাস হয় না; সত্যিই তার বিয়ে হবে? স্বামীর ঘরে সে যাবে? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি? ঘরে ঘরে তো এমনি হচ্ছে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেছে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কী, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন!

উৎসাহে পড়ে রাত্রে তিলুর ঘুম এলো না চক্ষে। কী ভীষণ মশার গুঞ্জন বনে ঝোপে!